The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 1, pp 9-23, ISSN 2306-3920

সেরানজিং পালা : বিষয় ও শিল্প ভাবনা

ইস্রাফিল আহমেদ*

[**সার-সংক্ষেপ :** বাংলাদেশে বসবাসরত উল্লেখযোগ্য নৃগোষ্ঠী গারো সম্প্রদায়। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। সেই সাথে রয়েছে লোকজ নানা সংস্কার, উপকথা, রূপকথা, লোককথা, কৃত্য, নৃত্য, গীত ও বিভিন্ন আখ্যানমূলক পালার বিশাল ভাণ্ডার। নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে গারোরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী এবং তিব্বতীবর্মণ বোড়ো উপশাখার অন্তর্ভুক্ত। তাদের সেরানজিং পালা ঐতিহ্যবাহী পালা হিসেবে বংশ পরম্পরায় পরিবেশিত হয়ে আসছে। এ পালার মাধ্যমে তাদের যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এই পালার বিষয়, রচনার ধরণ এবং উপস্থাপনারীতির মধ্যে শিল্প ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ।]

বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চাশের অধিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। সেই সাথে রয়েছে লোকজ নানা সংস্কার, উপকথা, রূপকথা, লোককথা, কৃত্য, নৃত্য, গীত ও বিভিন্ন আখ্যানমূলক পালার বিশাল ভাণ্ডার। গারো নৃগোষ্ঠী শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট, গাজীপুরসহ বিভিন্ন জেলায় বসবাস করে। তবে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতী, টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় এরা অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। বাংলাদেশে এদের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়ে ব্যাপক সংখ্যক গারো নৃগোষ্ঠীর বসবাস। নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে গারোরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী এবং তিব্বতীবর্মণ বোড়ো উপশাখার অন্তর্ভুক্ত। পুরাণে বিশেষ করে মহাভারতের কালে গারো জাতি ও অন্যান্য মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় এদেরকে কিরাত জাতি বলে অভিহিত করা হত। এছাড়া মহাভারতের ন্যায় রামায়নেও গারোদের কিরাত বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

ধারণা করা হয় গারোদের আদি নিবাস চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিন-কিয়াং প্রদেশ। এক সময় তারা দেশত্যাগ করে তিব্বতে দীর্ঘদিন বসবাস করে। এরপর ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় এবং বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের কিছু এলাকায় তারা বসবাস শুরু করে। ঐতিহাসিকদের মতে গারোরা প্রায় ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার বছর আগে গারো পাহাড়ে বসবাস শুরু করে। দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে একসময় তারা ময়মনসিংহ জেলায় নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এদের মূল পেশা কৃষি। তারা মূলত পাহাড়ের জঙ্গল কেটে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে জমি

---

* **ড. ইস্রাফিল আহমেদ :** অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিস্কার করে চাষাবাদ করে। একই ক্ষেতে তারা নানা রকম ফসলের চাষাবাদ করে থাকে। মাটি খুঁড়ে একই গর্তে বিভিন্ন ধরনের শস্য ও তরকারীর বীজ বপন করে। এই ফসল ফলানোকে জুম চাষ বলে (শিকদার, ২০১৫:০৯)।

জুম চাষকে কেন্দ্র করে গারো নৃ-গোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের উৎসবাদি পালন হয়ে থাকে। ভাল ফসল ঘরে তুলার জন্য চাষাবাদের শুরুতে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য নানা রকম কৃত্য পালন করে। ফসল ঘরে আনার জন্য নিয়মিতভাবে যেন বৃষ্টিপাত হয় ফসলের যেন কোনো ক্ষতি না হয় জমিতে যেন প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় সেই ফসল যেন পরিবারের সকলকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করা যায় তার নিমিত্তে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। প্রধানত শস্য বপন, বৃদ্ধি, কর্তন, সংগ্রহ এরকম বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য বিভিন্ন উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে শস্য সংগ্রহের পর প্রধান যে উৎসব পালন করা হয় তার নাম ওয়ানগাল্লা (মজিদ, ২০০৬:২৩৮)। এ উৎসবে নানা রকম নাচ গান বিভিন্ন ধরনের পালা পরিবেশিত হয়। গারোদের তেমনি একটি বেশ জনপ্রিয় পালা সেরানজিং পালা।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রবতী, রূপবান প্রভৃতি লোকগাথা সাধারন মানুষ যুগ যুগ ধরে দেখে আসছে। এ জেলার গারো নৃ-গোষ্ঠীর লোকগাথা সেরানজিং পালাও সাধারণ মানুষ যুগ যুগ ধরে দেখে আসছে। এ পালা বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত। কাহিনির মধ্যে বর্ণনা, সংগীত ও নাচের মধ্যে তাদের আচার আচরণ কৃষ্টি ভাষা প্রকৃতির নানা রূপ রসসহ যাপিত জীবনের চিত্র ফুটে ওঠে। সাহিত্য ও নাটকীয়তার বিচারে কাহিনির বুনন, সংলাপ, স্থান-কাল, পাত্রপাত্রীর মন মানসিকতা তাদের যাপিত জীবনের চিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে সেরানজিং পালায়।

সামাজিকভাবে গারোরা সমাজ ব্যবস্থায় এক ধাপ এগিয়ে মাতৃ-তান্ত্রিক। অর্থাৎ পরিবারে মা-ই বড়ো কর্তা। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেমন ছেলেমেয়েরা পিতার পদবি গ্রহণ করে তেমনি মাতৃতান্ত্রিক বিধায় গারো পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা মায়ের পদ-পদবি ধারণ করে। সেজন্যে গারোদের আদি প্রথা অনুযায়ী পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মেয়েরা হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র নির্বাচিত মেয়েই সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করে। সেই নির্বাচিত মেয়েকে গারো ভাষায় নক্না বলে। গারো সমাজের সাধারণত প্রথা অনুয়ায়ী পরিবারের কনিষ্ঠ কন্যা সন্তানকেই নক্না নির্বাচন করা হয়। অন্যদিকে একজন পিতা ঘর বাড়ি বা পরিবারের দেখভালের দায়িত্ব পালন করে মাত্র। তবে বর্তমানে মা-বাবা তাদের জীবিতাবস্থাতেই পুত্রসন্তানের নামে জমি লিখে দেয়ার রেয়াজ চালু রয়েছে।

সমগ্র গারো সমাজ ১৩টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এরা হলো: আওয়ে, আবেং, আত্তং, রূগা, চিবক, চিসক, দোয়োল, মাচ্চি, কচ্চু, আতিয়াগ্রো, মাৎজাংচি, গারা-গানচিং ও মেগাম। বাংলাদেশে আবেং, রূগা, আত্তং, মেগাম, চিবক প্রভৃতি দলভুক্ত গারোরাই বসবাস করে। বাংলাদেশে আবেং দলভুক্ত গারোদের সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। ১৩টি দল ছাড়াও সমগ্র গারো সমাজ ৫টি গোত্রে বিভক্ত। গোত্রগুলো হলো: সাংমা, মারাক, মোমিন, শিরা ও আরেং। গারো সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণরূপে অসবর্ণ প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একই উপগোত্রের মধ্যে বিবাহ গারো সমাজে নিষিদ্ধ। গারোরা নিজেদেরকে ‘আ.চিক’ বলে। এর দুটো অর্থ হয়। ১. ‘আ.আ’ মানে মাটি এবং ‘চিক’ বা ‘চিক্কা’ মানে কামড়ানো এবং ২. ‘আ.আ’ মানে মাটি এবং ‘চিক’ বা ‘বোচিক’ মানে উঁচু খাড়া পাহাড় (চাকমা, মঙ্গল কুমার, ২০১০:১২১)। আবার মান্দি মানেও পাহাড়ের মানুষ এবং জাতিগত পরিচয়ের ক্ষেত্রে মান্দি, আ.চিক বা আচ্ছিক বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। গারোদের ভাষায় মান্দি শব্দের অর্থ মানুষ। আর আচ্ছিক শব্দের অর্থ পাহাড়ী। অন্যদিকে যারা সমতলে বসবাস করে তাদের লামদানী বলা হয়। কিছু শহুরে নাগরিক সম্প্রদায় গারো নামটি তকমা দিয়ে তাদের নতুন করে পরিচয় দিয়ে থাকে। গারো নামটি তাদের মতে কারো চাপিয়ে দেওয়া এবং শ্লেষাত্মক বিধায় তাদের কাছে আপত্তিকর ও অবমাননাকর বলে মনে করে।

গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত। আহারে ভাতের সঙ্গে মাছ, মাংশ, ডাল ও শাকসবজি তাদের প্রিয় খাদ্য তালিকা। এছাড়া শুঁটকি মাছ তাদের অন্যতম একটি প্রিয় খাদ্য। মূলত ভৈরব, কিশোরগঞ্জের ভাঁটি এলাকায় প্রাপ্ত পুঁটি মাছের হিদল শুঁটকি গারোদের অতি প্রিয়। তরকারি রান্নায় বেশি পরিমাণে কাঁচা মরিচ তারা ব্যবহার করে। বিভিন্ন সবজির মধ্যে মিষ্টি কুমড়া, বেগুন, চাল কুমড়া, ঝিংগা, চিচিংগা, লাউ, করলা, বরবটি, কচু প্রভৃতি খেতে ভালবাসে। তারা রান্নায় ক্ষারজল অধিকহারে ব্যবহার করে থাকে। ইদানিং গারোদের রান্নার পদ্ধতি এবং রুচি বদলেছে। তারা নাখাম্ তরকারির পাশাপাশি ভর্তা, ভাজি, ডাল, মাছ, মাংস, নিরামিষ প্রভৃতি রান্নায় এবং আহারে প্রতিবেশি বাঙালিদের মতোই পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। এমনকি অবস্থাপন্ন পরিবারের লোকজনেরা খিঁচুড়ি, পোলাও, বিরিয়ানি অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। তাদের রান্নার পদ্ধতিও বর্তমানে বাঙালিদের অনুরূপ। শূকরের মাংস, কচ্ছপ এবং কুঁচে তারা পছন্দ করে। বাঁশের কঁচি চারা এবং ব্যাঙের ছাতা গারোদের অন্যতম আরো একটি প্রিয় সবজি। অতিথি আপ্যায়নে নানা পালাপার্বণে ধেনো পচুঁই[১] মদ গারোদের নিকট একটি অপরিহার্য অংশ। কৃষ্টির অঙ্গ হিসেবে এবং শারীরিক পরিশ্রমের পর ক্লান্তি দূর করার জন্যে গারোরা পঁচুই পান করে।

অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মত গারোদের পোশাকের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। তাদেও পোশাক পরিচ্ছদ অনেকটা বাঙালিদের মতো মনে হলেও তার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। পুরুষেরা লুঙ্গি, গেঞ্জি, পাজামা, ট্রাউজার, শার্ট এবং মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, সালোয়ার কামিজ ও ওড়না ব্যবহার করে। গারো মহিলাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিচ্ছদ রয়েছে এবং সেগুলো তারা অনেক সময় ঘরোয়া পরিবেশে ব্যবহার করে। গারোরা এই পোশাককে দক্বান্দা, দকবান্দা বা দকসারি বলে। দক্বান্দায় বিভিন্ন শিল্পকর্ম চিত্রিত থাকে। ব্রিটিশ শাসনকালে গারো পুরুষরা হাফপ্যান্ট এবং শার্ট ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। একসময় গারো পুরুষেরা ধুতি শার্ট ব্যবহার শুরু করে। তারা বড়ো সাইজের রঙীন গামছা ধুতির কায়দায় পিছনে মালকাছা করে পরিধান করে। সেই সাথে গেঞ্জি বা শার্ট ব্যবহার করে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমানে গারোরা লুঙ্গি ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। আগেকার দিনে গারো মহিলারা চাঁদিরূপার গহনাই বেশি ব্যবহার করতেন। বর্তমানে অবস্থাপন্ন পরিবারের মহিলারা সোনার গহনা ব্যবহার করে। খ্রিস্টান ধর্মমতে বিবাহের সময় বর-কনে উভয়েরই আংটি পরিধান এবং আংটি বিনিময় অবশ্য পালনীয়।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতায়াত শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান প্রভৃতি বিষয় খুবই নাজুক অবস্থায় ছিল। তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না বললেই চলে। এখন আর সে অবস্থা নেই। বর্তমানে যাতায়াত ব্যবস্থা অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। এখন সরকারি এবং বেসরকারি সাহায্য সংস্থ্যা এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রে গারোরা ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে খ্রিস্টান মিশনারিগণ গারোদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু করে। ধর্ম প্রচারের শুরুতে তাঁরা গুরুত্বারোপ করে শিক্ষার উপর। বর্তমানে গারো অধ্যুষিত প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মিশনকেন্দ্রগুলিতে উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। গারোদের শিক্ষার হার বর্তমানে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গারোরা বাংলাদেশে আগমনের সময় তারা সনাতন ধর্ম পালন করত। বর্তমানে গারোদের শতকরা নিরানববই জনই খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। বিভিন্নভাবে খ্রিস্টানদের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে গারোদের ধর্মান্তরিত করা হয়। গারোরা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। আদি ধর্মে বিশ্বাসী গারোদের সমাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিংবা সমাজে যারা খামাল্ অর্থাৎ পুরোহিত হিসেবে গণ্য তারাই কেবল দেবদেবীর অস্তিত্ব এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞাত। সমাজে খামালদের বিরাট ভূমিকা

---

১. নিজেদের তৈরি পাস্তরিত মদ

রয়েছে। এই খামালই বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করে। অসুখ-বিসুখের কারণ নির্ণয় করে। কোন দেবতার কোপদৃষ্টিহেতু অসুখ হয়েছে তা ধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে তা প্রতিকার বিধান করে। স্বপ্নযোগেই খামালদের দেবদেবীরা উপাসনামন্ত্র শেখায় এবং সেই মন্ত্র নির্দিষ্ট কোনো একটি মন্ত্র নয়। প্রায় প্রতিটি দেবদেবীর উপাসনায় নানা ধরনের মন্ত্র রয়েছে। খামাল্ বংশ পরম্পরায় নিযুক্ত হয় না। সমাজের যে কেউ নিজ যোগ্যতাবলে খামাল্ নিযুক্ত হতে পারে। তবে সাধারণত সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী পূর্ণবয়স্ক পুরুষই দৈব প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খামাল পদে আসীন হন।

বাংলাদেশে বসবাসরত গারো এবং খাসিয়া দুটি নৃগোষ্ঠী মাতৃতান্ত্রিক। অধিকাংশ আদিবাসী পিতৃতান্ত্রিক। নৃতত্ত্বের জনক হ্যানরি লুইস মর্গান প্রাচীন সভ্য জাতির বৈশিষ্ট্যের আলোকে মন্তব্য করেছেন যে মাতৃ অধিকারের ভিত্তিতে সংগঠিত এই গোত্রই হচ্ছে আদিরূপ। এর পর পিতৃ অধিকার অনুযায়ী সংগঠিত পরবর্তী গোত্রের উৎপত্তি। গারোদের সমাজে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা প্রচলিত। তাদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের নাম ওয়ানগাল্লা (মজিদ, ২০০৬:২৪০)। এই উৎসবে সাধারণত দেবতা মিসি আর সালজং এর উদ্দেশ্যে উৎপাদিত ফসল উৎসর্গ করা হয়। উল্লেখ্য ওয়ানগাল্লা না হওয়া পর্যন্ত মান্দিরা নতুন উৎপাদিত ফসলাদি খেত না। আশ্বিন মাসে একেক গ্রামের মানুষদের সামর্থ্যানুযায়ী কখনো তিন দিন কখনো সাত দিন ধরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গারোদের প্রধান দেবতার নাম তাতারা রাবুগা। এছাড়াও অন্যান্য দেবতারা হলেন- মিসি সালজং, সুসমি, গয়ড়া প্রমুখ।

প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীর কমবেশি নিজস্ব ভাষা থাকে। এই ভাষার মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহজ সরল ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে। ভাষা হল মায়ের মত। গারোদের ভাষার স্থানীয় নাম মান্দি। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, গারোরা যে ভাষায় কথা বলে তা মূলত সিনো-টিবেটান (Sino Tibetan) ভাষার অন্তর্গত টিবেটো বার্মান (Tibeto Burman) উপ-পরিবারের আসাম-বার্মা শাখার অন্তর্গত বোডো বা বরা (Bodo/Bora) ভাষা উপ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে বসবাসরত গারোদের দৈহিক আকৃতি মাঝারি ধরনের। তাদের দেহ সাধারণত লোমহীন। নাক চ্যাপ্টা, চোখ ছোট ছোট। গায়ের রং শ্যামলা। তাদের দাড়ী গোঁফ তেমন নেই বললেই চলে তবে পরিবেশগত কারণে তাদের দৈহিক গঠন বেশ শক্তিশালী হয়ে থাকে। ১৮০৮ সালে বুকানন হ্যামিলটন গারোদের চীনাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কর্মক্ষম মানুষদের মত বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

গারোদের ঐতিহ্যবাহী সনাতন ধর্মের নাম সাংসারেক। এর সঠিক অর্থ নির্ণয় করা কঠিন। তবে গবেষকদের মতে সম্ভবত বাংলা সংসার থেকে সাংসারেক শব্দটি এসেছে। গারোরা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মত পূজা অর্চনা করে থাকে। তাদের প্রধান পূজা ওয়ানগাল্লা। সালজং (Saljong) তাদের উর্বরতার দেবতা এবং সূর্য সালজং এর প্রতিনিধি। ফসলের ভালোমন্দ এই দেবতার উপর নির্ভর করে বলে তাদের বিশ্বাস। সুসাইম (Susime) ধন দৌলতের দেবী এবং চন্দ্র এই দেবীর প্রতিনিধি। গোয়েরা (Goera) গারোদের শক্তি দেবতার নাম। কালকেম (Kal Kame) জীবন নিয়ন্ত্রণ করে বলে গারোদের বিশ্বাস। গারোদের বিভিন্ন উৎসবে তাদের ঘরবাড়ি পরিস্কার পরিচ্ছন্দ করে রাখে। এরপর ঘরের দেয়ালগুলো নানা ধরনের আলপনা করে সাজিয়ে থাকে। তাদের যেকোনো উৎসবে নাচ গান আনন্দ উল্লাসের কোনো কমতি থাকে না। এই আনন্দ উল্লাসের মধ্যে তারা নানা ধরনের অনুষ্ঠানসহ নাটকেরও আয়োজন করে থাকে। তার মধ্যে দর্শকদের প্রধান আকর্ষণ থাকে সেরানজিং পালা।

সেরানজিং পালার কাহিনিতে দেখা যায় সুদূর তিব্বত থেকে আসা উপজাতীয়দের একটি দল বাংলাদেশের জৈন্তা ও গারো পাহাড়ে নিজেদের সুবিধানুযায়ী বসবাস শুরু করে। এই দলের মূল চরিত্র সেরানজিং তার পিতা-মাতার সাথে আগমণ করে। তারা অবস্থান করে খাসিয়া পাহাড়ের মিগাম অঞ্চলে। সেরানজিং এর বাবার নাম সলনারং এবং মা-র নাম চিনারাং। দিন যায় মাস আসে তারপর আসে বছর। সলনারং এবং মা চিনারাং এর কোলে আসে একে একে দুটি কন্যা সন্তান। আদরমাখা

স্নেহের কন্যাদের নাম রাখে সেরানজিং আর সেরানী। দিনে দিনে বড়ো হয়ে ওঠে দুই বোন। সারাদিন ঘুরে বেড়ায়, ছোটাছুটি করে। তাদের আনন্দের কোনো শেষ নেই। কিন্তু তাদের এই আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হয় না। জগত সংসার কোনোকিছু বোঝার আগেই তাদের বাবা অকালে প্রাণ হারায়। তাদের মা এই সন্তানদের নিয়ে মহাবিপদে পড়ে। কি করে তাদের দেখাশোনা করবে। কিভাবে তাদের মানুষ করবে। এ চিন্তায় মা-র চোখে ঘুম হয় না। চিন্তায় চিন্তায় মা অসুস্থ হয়ে একদিন সেও প্রাণত্যাগ করে। দুই বোন মৃত মাকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আপন বলে তাদের আর কেউ নেই। এখন তারা কি করবে ভেবে পায় না। বড়ো বোন সেরানজিং ছোট বোন সেরানীকে জড়িয়ে অঝোরে আর্ত চিৎকার করতে থাকে। এ সময় পাশ দিয়ে কয়েকজন লোক ঐ পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। বাচ্চা মেয়েদের করুণ কান্না শোনে এগিয়ে আসে। তাদের এ অসহায় অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করে–

: তোমাদের কি কোনো আত্মীয় স্বজন নেই?

সেরানজিং অসহায়ের মত কাঁদতে কাঁদতে বলে–

: দেখুন, আমরা খুবই দুঃখী। আমরা এখন কি করব, কোথায় যাব? দয়া করে আমাদের মেসো ও মাসিকে খবর দিবেন।

তারা আরো জানায়- আমাদের মা মারা গেছে। এখানে আমাদের আপন বলতে কেউ নেই। আমরা এখন কি করব কোথায় যাব? কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে গারো পাহাড়ে বালশ্রীগিত্তিম গ্রামে আমাদের মায়ের আপন ছোট বোন নরেং নামে এক খালা আছে। আর আমাদের মেসুর নাম সিমরেং। তাছাড়া সেখানে আমাদের দুজন মামাও আছে। তাদের নাম সাংওয়ান আর মাংওয়ান। দয়া করে তাদের খবর জানালে হয়ত আমাদের উপকার হবে। পথিকদের মধ্যে একজন বলে-

: ঠিক আছে মা, তোমরা চিন্তা করো না। আমরা এক্ষুণি সেখানে যাচ্ছি। অবশ্যই তাদেরকে নিয়ে আসব। তোমরা ততক্ষণ অপেক্ষায় থাক (রহমান, ১৯৯৫:৬৩-৬৪)।

এ কথা বলে পথিক দূত বেগে ছুটে চলে বালশ্রীগিত্তিম গ্রামে। সেরানজিং আর সেরানী তখন তাদের আত্মীয়দের অপেক্ষায় থাকে। এভাবে কাহিনি সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

সেরানজিং এর মামা মামী গভীর জঙ্গলে গাছ কাটতে যায়। সেখানে ওয়ালজান নামে এক সুদর্শন পুরুষ মনের দুঃখে গান গাইতে থাকে। মামা-মামী সে গান শুনে এগিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ সেখানে বাঘের গর্জন শুনতে পায়। বাঘের হুংকার, তর্জন-গর্জন এবং মানুষের আর্ত চিৎকার শুনে প্রথমে তারা ভয় পেয়ে যায়। লুকিয়ে গাছের আড়াল থেকে দেখতে থাকে কি হয়েছে? দূর থেকে তারা দেখে সুদর্শন এক যুবক একটি বাঘের সাথে প্রাণপণে সমানে লড়ে যাচ্ছে। যেকোনো সময় বিপদ হতে পারে। তখন সিমরেং সাহস করে স্বামী-স্ত্রী দুজনে যুবকটির সাথে যোগ দিয়ে লড়াই করে বাঘকে পরাস্ত করে। এ সময় মঞ্চে একজন অভিনেতা বাঘের মুখোশ পড়ে বাঘের মতো হুংকার দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। তারপর ওয়ালজানকে আক্রমণ করে। এসময় একবার ওয়ালজান মাটিতে পড়ে যায় আবার পরক্ষণে বাঘকে পরাস্ত করার জন্য মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে যুবককে রক্ষা করার পর তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে তার বাড়ি খাসিয়া পাহাড়। বাবার মৃত্যুর পর সে বনে বনে ঘুরে বেড়ায় আর লোকালয় খুঁজে। একথা শুনে তাদের মন খারাপ হয়ে যায়। সিমরেং ও নরেং এর কোনো সন্তান ছিল না। তাই দুজনেই যুবকের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের বাড়িতে আশ্রয়ের জন্য নিয়ে আসে। ওয়ালজান আনন্দ চিত্তে তাদের ভালবাসা গ্রহণ করে।

সেরানজিং এর মায়ের মৃত্যুর সংবাদ তার মামা-মামীকে পৌঁছে দেবার জন্য যে পথিক রওয়ানা হয়েছিল সে যথা সময়ে বালশ্রীগিত্তিম গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। তখন মামা-মামী বাড়িতেই ছিল। পথিকের মুখে বড়ো বোনের মৃত্যু সংবাদ শোনে খুবই মর্মাহত হয়। তখন আশে পাশের সবাই জড়ো হয়। মাসি নরেং, সেরানজিং এর মামা মাংওয়ান এবং সাংওয়ান সবাই বোনের বাড়িতে ছুটে চলে।

পাহাড়ী উঁচু-নিচু রাস্তা পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যায় তারা সেরানজিংদের বাড়িতে এসে হাজির হয়। মৃত মাকে জড়িয়ে ক্লান্ত দেহে তখনও দুবোন কেঁদে চলেছে। মামাদের দেখে তাদের তখন কান্না আর থামতে চায় না। মাসি তাদের বোনের অনাথ দু সন্তানকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তখন মেসো সিমরেং বলে, কেঁদো না বাছারা। তোমাদের মা-বাবা নেই তো কি হয়েছে। আজ থেকে আমরাই তোমাদের মা-বাবা। অবশেষে সবার সহযোগিতায় মাকে পাহাড়ের ঢালে দাহ করে। তারপর রাতে মামা-মামী, মেসো-মাসি অবস্থান করে সেরানজিংদের বাড়িতে। পরদিন সকালে অনাথ মেয়েদের নিয়ে বালশ্রীগিত্তিম যাবার উদেশ্যে যাত্রা করে। মায়ের ভিটা-মাটি ছেড়ে তাদের মন কিছুতেই যেতে চায় না। তাদের অনেক বুঝিয়ে তারপর বাড়ি থেকে যাত্রা করে। দিন রাত একটানা পদযাত্রা শেষে অবশেষে পরিশ্রান্ত হয়ে তারা বালশ্রীগিত্তিম গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। গ্রামের পাশেই সিমসাং অর্থাৎ সোমেশ্বরী নদী। এই নদীর পাশেই সিমরেং ও নরেং এর বাড়ি। এ বাড়িতে আরো একজন বসবাস করে তার নাম ওয়ালজান। সে বেশ সাহসী বুদ্ধীদিপ্ত শক্তিশালী এবং সুদর্শনও বটে। এ পরিবারের নরেংকে সে মা এবং সিমরেংকে বাবা বলে ডাকে। প্রায়শ সে পাহাড়ে জঙ্গলে গাছ কাটতে যায়, জুম চাষ করে। ভাল ছেলে হিসেবে তার যেমন সুনাম তেমনি সকলের সাথে তার ভাল সুসম্পর্ক রয়েছে।

নতুন জায়গা নতুন পরিবেশে সেরানজিং আর সেরানীর মন খুব কষ্টে দিন অতিবাহিত হয়। একদিন সকালে সিমসাং নদীতে সেরানজিং তার ছোট বোনসহ নদীতে স্নান করতে যায়। স্নান করতে এসে হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ে। ছোট বোনের আড়ালে সেরানজিং অঝোরে কান্না করতে থাকে। হঠাৎ দিদির চোখে জল দেখে তারা দুবোন একে অপরকে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কখন যে বেলা পড়ে গেল দুবোন সময়ের হিসেব মেলাতে পারে নি। সেদিন ওয়ালজান সকালবেলা পাহাড়ে জুম চাষে গিয়েছিল। ফিরতে ফিরতে বিকেল। সিমসাং নদীর ধার ঘেসে সেরানজিং আর সেরানীর কান্নার শব্দ শুনে নদীতে নামে। তাদের অবস্থা দেখে ওয়ালজানের খুব মায়া হল। ওয়ালজান কাছে গিয়ে খুবই আদরমাখা প্রশ্ন করে-

: তুমি কে? উত্তরে সেরানজিং বলে
: আমা খোদে চিনারাং আপফা খোদে সলনারাং
আপফা বিমুং মিংফারা আংখো মিংয়া সেরানজিং (রহমান, ১৯৯৫:৬৬)।

এ কথায় ওয়ালজানের অনুমান করতে কোনো অসুবিধা হল না যে তারা নরেং এর বোনঝি। এর মধ্যে তারা আরো কিছুক্ষণ স্নান শেষ করে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা শেষে ওয়ালজানের সাথে তাদের মাসির বাড়িতে ফিরে আসে। ইতোমধ্যে দুবোনও অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে ওয়ালজান তাদেরই মাসতুতো ভাই।

মাসির বাড়িতে প্রথম দিকে তাদের বেশ আদর যত্ন ছিল। কিন্তু দিন যত গড়িয়ে যায় মাসির আদর তত কমতে থাকে। সংসারের বাস্তবতায় মাসি তাদের দিয়ে দৈনন্দিন কাজে বেশ ব্যবহার করে। যেমন নদী থেকে পানি সংগ্রহ, জুম চাষে সাহায্য করা, রান্নার কাজে খড়ি সংগ্রহ, ঘরদোর পরিস্কার রাখাসহ নানান কাজে সারাদিন ব্যস্ত রাখে। নিজের মা থাকলে হয়ত এরকম কঠিন কাজ করতে হতো না। সে জন্যে নীরবে তাদের প্রাণ কাঁদে। মাসির এ অত্যাচারের কথা ওয়ালজান ভাল করেই অনুভব করে। কিন্তু তার যে কিছুই করার নাই। কারণ সে নিজেও একজন ভীনদেশি। ওয়ালজান তাই গভীর মমতায় জিজ্ঞেস করে-

: তুমি কাঁদছ কেন সেরানজিং? (রহমান, ১৯৯৫:৬৭)।

সেরানজিং এর আচরণ, দেহ ভঙ্গিমা এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের মধ্যেই উত্তর দেয়া হয়ে যায়। তার আর মুখ ফুটে উত্তর দেয়ার প্রয়োজন হয় না। ওয়ালজান বলে- আমি জানি এখন তোমার মাসি তোমাকে দিয়ে অনেক কঠিন কাজ করায়। আমার কাছ থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখে। সেই দুঃখেই তুমি কাঁদছ!

এভাবে দিন যায় মাস আসে। এর পর আসে বছর। ঋতুর পরিবর্তনের মত সেরানজিং এর দেহেও পরিবর্তন আসে। সে মাসির হুকুমে ওয়ালজানের সাথে গরু বাছুর নিয়ে পাহাড়ে জুম চাষে যায়। নানা কাজের মধ্যদিয়ে একদিন সেরানজিং এর পরনের গান্না[২] ছিঁড়ে যায়। এখন সে পূর্ণ যুবতী। ছিন্ন বস্ত্র পড়ে বাইরে যেতে লজ্জা পায়। বিশেষ করে ওয়ালজানের কাছে একটু বেশিই লজ্জা পায়। কারণ দুজনের মধ্যে এক ধরনের মায়া মহব্বত গভীর হয়েছে। ফলে ওয়ালজানকে নিয়ে এখন সে অনেক স্বপ্ন দেখে।

একদিন ছিন্ন বস্ত্র পড়ে সেরানজিং নদীর ঘাটে জল আনতে যায়। ওয়ালজান গরু নিয়ে তখন ফিরছিল। হঠাৎ সে দেখে সেরানজিং লজ্জাবণত হয়ে ছিন্ন বস্ত্র অংশ ঢেকে বসে আছে। ওয়ালজান তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে সে জানায় তার গিন্না ছিঁড়ে গেছে। ওয়ালজান বলে ঠিক আছে মাসিকে বলে তোমাকে কাপড় কিনে দেব।

যত দিন যায় মাসির যন্ত্রনা তত বেড়ে যায়। এখন ওয়ালজানের সাথে প্রায় প্রতিদিন জুম চাষে পাহাড়ে যেতে হয়। গাছ কাটতে হয়। গভীর জঙ্গলে ওয়ালজানের সাথে কাজ করতে গিয়ে তার শরীরে শিহরণ জাগে। ভরা যৌবনে সেরানজিং নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। ক্লান্ত দেহে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে রাতে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে। ওয়ালজান যদি আমার স্বামী হত। কিন্তু তা তো হবার নয় কারণ সে যে তার খালাত ভাই। তবে ওয়ালজান ভাল করেই জানে সেরানজিং তার বোন নয়। এমনকি একই মাহারীভূক্তও নয়।

একদিন ওয়ালজান, সেরানজিং আর সেরানী তারা তিনজন জুম চাষে অনেকক্ষণ কাজ করার পর চাম্বিল গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল এবং বাড়ি থেকে আনা থাবুল চু[৩] খাচ্ছিল। এমন সময় সেরানীকে রাউগগ দিয়ে ঝর্ণা থেকে পানি আনার জন্য পাঠিয়ে ওয়ালজান প্রেমের দৃষ্টিতে সেরানজিং এর দিকে কামার্তভাবে নজর দিলে সে লজ্জা পেয়ে যায়। বলে-

: কি দেখছ দাদা?

: দেখছি তোমাকে। তোমার এই রূপ, এই লাবণ্য আমাকে দিন দিন ভাবিয়ে তুলছে। যেখানেই থাকি তুমি সর্বদা আমার চোখে ভাস (রহমান, ১৯৯৫:৬৯)।

সেরানজিং ওয়ালজানের মনের কথা বুঝতে পেরে বলে- দাদা এ রঙ্গিন স্বপ্ন যে কোনো দিন বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ তুমি যে আমার মাসতুতু ভাই। তাছাড়া এ জগতে আমাদের আপন বলতে কেউ নেই। মাসি যদি আমাদের সম্পর্ক জানতে পারে তাহলে তাড়িয়ে দিবে। ওয়ালজান তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আজ তার আসল পরিচয় প্রকাশ করে বলে-

: তোমার ধারণা ভুল সেরানজিং, আমি তোমার ভাই নই। আমি ভীনদেশি যুবক। তবে তোমার মাসি আমাকে পুত্রবৎ আদও করেন (রহমান, ১৯৯৫:৬৯)।

কাজেই পৃথিবীতে তোমাকে কেউ ঠাঁই না দিলেও আমি তোমার পাশে চির দিন আছি, থাকব। তুমি যে আমার সব। তুমাকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। এ কথা শুনে সেরানজিং প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে না। হত বিহ্বল হয়ে পড়ে। এতদিন তাকে মাসির ছেলে ভেবে প্রেম নিবেদন করার কথা চিন্তাই করতে পারে নি। তা এক নিমিষে দূর হয়ে গেল। কী করবে ভেবে পায় না। সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। এতদিন কী ঘোরের মধ্যেই না ছিল সেরানজিং। আজ সব কিছু পরিস্কার হয়ে বাঁধা বিপত্তি সব দূর হয়ে গেল। গল্পের এখানেই চমক। তাদের সম্পর্ক উন্মোচনের পূর্বেই পাঠক-দর্শক সব কিছু বুঝে যায়। কিন্তু গল্পের

---

২. কোমর থেকে হাটু পর্যন্ত মোড়ানো কাপড়।

৩. গারো আলু

প্রধান দুই চরিত্রের আসল সম্পর্ক উন্মোচন হয় তাদের মোহাবিষ্ট রেখে। এরকম প্রাচীন গ্রীক নাটকেও পাওয়া যায়। এখানেই গল্পের সার্থকতা। এর পর দিন শেষে রাত আসে। সে রাতে সেরানজিং তার শোবার ঘরে এপাশ ওপাশ করে। তার ঘুম আসে না। এতদিন যাকে নিয়ে মনে মনে স্বপ্ন দেখেছে আজ তার মনের কথা বুঝতে পেরে সারারাত শুধু ওয়ালজানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। মনের মধ্যে যেন প্রেমের বন্যা বয়ে যায়। কখন যে রাত শেষ হয়ে ভোর হয়ে যায় টেরই পায় নি।

পরদিন সকালবেলা যথারীতি তারা তিনজন কাজে বের হয়। জঙ্গলে দীর্ঘক্ষণ গাছ কাটার পর একটা গাছের নিচে তারা বিশ্রামের জন্য বসে। ইতোমধ্যে সেরানী তাদের প্রেমের কথা বুঝতে পেরেছে। তাই তাদের কিছুটা সুযোগ দেবার লক্ষে কাজের উছিলায় চোখের আড়ালে চলে যায়। ওয়ালজান একটা বিড়ি ধরিয়ে সেরানজিং এর মুখের পানে এক পলক তাকিয়ে থাকে। সেরানজিং কাঁপা গলায় জানতে চায়-

: কী দেখছো দাদা?

: দেখছি তোমার রূপ। কিন্তু আজ তোমার চোখ লাল কেন বলতো?

: সে তো তুমিই করেছ।

: আমি কি করলাম। আমি কি তোমার চোখে আঘাত করেছি কখনও?

: চোখে করনি, মনে করেছ। আর সে মনই আমাকে সারারাত ঘুমোতে দেয় নি।

: সত্যি বলছ সেরানজিং? (রহমান, ১৯৯৫:৭০-৭১)।

এ সময় সেরানজিং নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারে না। তাদের আবেগমাখা সংলাপ যেকোনো প্রেমিক-প্রেমিকার মনকে নাড়া দেয়। ওয়ালজান সেরানজিং এর মুখমণ্ডল দুহাতে আরো কাছে টেনে নিয়ে পরম আদরের সাথে চুম্বন করে বলে আহারে-বিহারে শয়নে-স্বপনে আমার জীবনে কেবল তুমি আর তুমি। তুমি ছাড়া আমার জীবনে আর কেহ নাই। সেরানজিং ওয়ালজানের গ্রীবা জড়িয়ে একরাশ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ওয়ালজান বনের লতা জড়িয়ে দিল সেরানজিং এর গলায়। আর খোপায় পড়িয়ে দিল একগুচ্ছ বন্য ফুল। তাদের প্রেমের স্বাক্ষী রইল গভীর অরণ্য আর সুবিশাল পাহাড়।

এদিকে মেসো সিমরেং সেরানজিং ও ওয়ালজানের আচরণের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে। তার মনে সন্দেহ হয়। একদিন সে তারা যে বনে কাঠ সংগ্রহের জন্য যায় তার পাশ দিয়ে একটা কাজে যাবার পথে সিমরেং তাদের কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে লুকিয়ে তাদের সন্ধান করতে থাকে। হঠাৎ তাদের প্রণয় লীলা প্রত্যক্ষ করে রাগে ক্ষোভে আর তার কাজে না গিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে এবং স্ত্রীর নিকট সব কিছু প্রকাশ করে দেয়। তারপর সিদ্ধান্ত নেয় তাদের এক হাবাগোবা গোছের ভাগ্নে থোরা-র সাথে সেরানজিং এর বিয়ে দিবে। থোরার বাবার সাথেও এ নিয়ে আলোচনা করে এবং সিদ্ধান্ত হয় আগামী ওয়ানগাল্লা উৎসবে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হবে। পরদিন সকালে মাসি এ কথা সেরানজিংকে সাফ জানিয়ে দেয়। এর পর থেকে সেরানজিংকে এমন সব কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় যাতে ওয়ালজানের সাথে তাদের আর দেখা সাক্ষাত না হয়। এভাবে অনেকদিন তাদের সাথে দেখা করার কোনো সুযোগই পাচ্ছে না। একদিন ওয়ালজান তৃষ্ণায় সোমেশ্বরী নদীতে পানি পান করার সময় দেখে উজান থেকে ঘোলা পানি আসছে। তখন সে নদীর তীর ধরে এগিয়ে সেরানজিং এবং সেরানীর দেখা পায়। ওয়ালজানকে দেখেই সেরানী তাকে কিছুটা শঙ্কিতভাবে বলে–

: দাদা তুমি আর এ পথে পা বাড়িও না। মামা ও মেসো তোমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেলে নির্ঘাত মেরে ফেলবে।

: মৃত্যুকে বীরেরা কখনো ভয় করে না। বাঘের সাথে লড়াই করেছিলামমনে পড়ে? (রহমান, ১৯৯৫:৭২)।

সেরানজিং হাতজোড় করে ওয়ালজানকে সাবধান করে বলে তাদের এখন এভাবে মেলামেশা না করাই ভাল। তারপর বলে–

: তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে, দোহাই তোমার– এক্ষুণি তোমার কাজে যাও। তোমাকে ওরা মারলে আমি তা সহ্য করতে পারবো না। আমি আত্মহত্যা করব (রহমান, ১৯৯৫:৭২)।

এ কথা বলে ওয়ালজানকে দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে বলে। তখন ওয়ালজান বলে-

: আমি চলে যাচ্ছি সেরানজিং। তবে শুধু একটি কথার জবাব দাও– তুমি কি শেষ পর্যন্ত আমার হবে?

: ও কথা বলে আমাকে আর কষ্ট দিও না। সালজং দেবতার দোহাই দিয়ে বলছি– আমি তোমার (রহমান, ১৯৯৫:৭২)।

অনেকদিন ধরে মাসি নরেং সেরানজিং-কে এখন চোখের আড়াল হতে দেয় না। সব সময় চোখে চোখে রাখে। একদিন তাকে ডেকে বলে-

: এখন থেকে তুমি ঘরের কাজ করবে, আর বাইরের কাজ করবে সেরানী (রহমান, ১৯৯৫:৭৩)।

এ কথা শোনে সেরানজিং এর মাথায় যেন বাজ পড়ে। কিছুই বুঝতে পারে না। ওয়ালজানের সাথে কোনো দেখাও করতে পারে না। ওয়ালজানকে এখন জুম চাষে পাহারা দেবার জন্য ব্যস্ত রাখে। সেখানে খাবার পানি সরবরাহ করে সেরানী। ওয়ালজানের সাথে অনেক দিন দেখা সাক্ষাত নাই বলে সেরানীকে দিয়ে খবর পাঠায় সে যেন সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে প্রাপফাং[৪] গাছের নিচে দেখা করে। তা না হলে সে মারা যাবে। সংবাদ পেয়ে ওয়ালজান বট গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। সেরানজিং পূর্ব ঘোষিত বট গাছের নিচে এসে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে ওয়ালজানের কোনো দেখা না পেয়ে ভয়ে অভিমানে প্রতীক্ষার ব্যর্থতাজনিত ক্ষোভে মনটা ছটফট করতে থাকে। এমন সময় আড়াল থেকে ওয়ালজান পা টিপে টিপে সেরানজিংকে চমকে দেয়। রাগ ক্ষোভ, মান-অভিমান সমস্ত কিছু ওয়ালজানকে পেয়ে ভুলে যায়। এক নিমিষে তার সমস্ত রাগ ক্ষোভ হতাশা কেটে যায়। সেরানজিং ওয়ালজানের বুকে মুখ লুকিয়ে কিছুক্ষণ গুমরে কাঁদতে থাকে। ওয়ালজান তার অশ্রু মুছে পরম আদরে কাছে টেনে নেয়। এ সময় সেরানজিং বলে-

: আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না। হয় সাথে করে নিয়ে চল কোথাও, না হয় গলা টিপে মেরে ফেল এ অভাগিনীকে (রহমান, ১৯৯৫:৭৪)।

ওয়ালজান তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে–

: এ দেশে আমার এমন কেউ নেই যার কাছে তোমাকে নিয়ে আশ্রয় পাব (রহমান, ১৯৯৫:৭৪)।

কিশোর বয়সে নর-নারীর প্রেম টালমাটাল অবস্থায় থাকে। আবেগ বশত যেকোনো সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করে। ভবিষ্যতে কি হবে তা চিন্তা করার জ্ঞান বুদ্ধি একটু কমই থাকে। তারা খুব অল্প সময়ে সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলে এক অজানা-অচিন পথের উদ্দেশ্যে চলে যাবার। তাদের সামনে কী ভাগ্য অপেক্ষা করছে তা তারা কিছুই চিন্তা করে না।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরও সেরানজিং ওয়ালজান বাড়ি না ফেরায় মাসির খুব সন্দেহ হল। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। কাছের লোকজনকে ডেকে আলাপ আলোচনা করে সিমরেং, সাংওয়ান, মাংওয়ানসহ সকলেই পাহাড়ময় খোঁজে বেড়ায়। কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। সেরানজিং ওয়ালজান চাঁদনী রাতের আলোয় সাবধানে পথ চলে। মামা মেসো শুকনো পাতার সাড়া শব্দ পেয়ে

---

৪. বটবৃক্ষ

ঝোপের আড়ালে গাছের উপরে লুকিয়ে থাকে। বিপদ সংকেত পেয়ে প্রেমিক প্রেমিকা আরো সাবধান হয়ে যায়। দূর থেকে লক্ষ করে ওয়ালজান আর সেরানজিং ধীর পায়ে চলে যাচ্ছে। মামা মামী খালা খালু তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ ওই তো ওরা পালিয়ে যাচ্ছে। মামা মেসো তাদের পিছু নিল। অল্প কিছুদূর গিয়েই তাদেরকে ধরে ফেলে। এসময় তাদের দুদলের মধ্যে লড়াই হয়। লড়াইয়ে ওয়ালজান পরাজিত হয়। এ সময় বর্শা নিয়ে তাকে আঘাত করার জন্য উদ্যত হলে সেরানজিং ওয়ালজানের প্রাণ ভিক্ষা চায়। তার প্রাণভিক্ষার অনুনয় বিনয় দেখে বলে-

: তোমাকে প্রাণে বধ করলাম না, তবে এখন থেকে তুমি আর এ অঞ্চলে থাকতে পারবা না। যদি আবার কোনোদিন এমন কাজ কর তাহলে তোমাকে আর ক্ষমা করা হবে না, যাও (রহমান, ১৯৯৫:৭৫)।

এর পর তারা সেরানজিংকে জোর করে বাড়ি নিয়ে আসে। তাকে এখন কীভাবে আটকে রাখা যায় তার জন্য চিন্তা করতে থাকে। অবশেষে মাথায় বুদ্ধি আসে সেরানজিংকে হাবাগোবা থোরার সাথে বিয়ে দিয়ে আটক করা যায়। যেই কথা সেই কাজ। সেরানজিংকে আটকে রেখে থোরার বাবাকে বিয়ের আয়োজন করতে খবর দেয়। অতি দ্রুত তাদের বিয়ে দেয়া হল খামাল[৫] ডেকে। দুটি মোরগ বধ করে মন্ত্র পাঠ করার সময় পুরোহিত ভবিষ্যত বাণী করে যায় 'এ বিয়েতে মিলন হবে না, বিচ্ছেদ ঘটবে স্বামী স্ত্রীতে' (রহমান, ১৯৯৫:৭৫)। এ যেন গ্রিক নাটকে ডেলফির মন্দিরের অলৌকিক বাণীর কথা স্বরণ করিয়ে দয়ে। বিয়ের পর সেরানজিং প্রতিজ্ঞা করে সে কোনো দিন থোরার সাথে বাসর শয্যায় মিলিত হবে না। পরিবারের অভিভাবকরা সেরানজিংকে থোরার ঘরে জোর করে প্রবেশ করিয়ে দেয় কিন্তু সে নানা ছল ছুতায় মধুর দেহ মিলন কর্ম থেকে বিরত থাকে। বেশ কয়েকদিন এভাবে চলে যায়। মনের কথা তার ছোট বোনকেও বলতে পারে না। কারণ তাকে দূরে সরিয়ে রাখে। একদিন হঠাৎ সেরানীকে কাছে পেয়ে তাকে দিয়ে ওয়ালজানকে সংবাদ পাঠায়। সোমেশ্বরী নদীর ঘাটে যে ছোট্ট বাড়িটা আছে সেখানেই ওয়ালজানের এক রাখাল বন্ধু থাকে। সেরানী যেন তাকে অবশ্যই সেখানে আসতে খবর দেয়। সংবাদ পেয়ে ওয়ালজানের বন্ধু পাহাড়ময় খুঁজে বেড়ায়। খুঁজতে খুঁজতে পাশের পাহাড়ে সন্ধান পায়। ওয়ালজান পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়। বন্ধু তাকে বলে–

: তোমার জন্য দিন গুনছে সেরানজিং। যদি তুমি তাকে গ্রহণ না কর তো সে আত্মহত্যা করবে। ...... সে সতী নারী (রহমান, ১৯৯৫:৭৬)।

বন্ধুর কথা শুনে ওয়ালজান দিশেহারা। কি করবে ভেবে পায় না। সে আরো জানতে পারে আগামী বুধবার সেরানীর বিয়ের পাত্র দেখার জন্য মামা মাসি অনেক দূর চলে যাবে। এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চায় ওয়ালজান। বন্ধুর সাথে এটাই তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়।

সেরানজিং বেশ কিছুদিন যাবত মনে মনে একটা পরিকল্পনা করে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সেদিন সারাবেলা থোরাকে চু[৬] পান করায়। অতিরিক্ত চু বা মদ পানের ফলে সেদিন সে সন্ধ্যা রাতেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। এ সুযোগে সেরানজিং তার সমস্ত গহনাপাতি তার বোনের নিকট রেখে ওয়ালজানের বন্ধুর সাথে রাতের অন্ধকারে সিমসাং নদীর ওপারে যেখানে ওয়ালজান অপেক্ষা করে আছে সেখানে যাবার পথে পা বাড়ায়। গভীর রাত, ঘন বন, নিশ্চুপ তারা পথ চলে। তারপর কলা গাছের ভেলায় খরস্রোতা সিমসাং নদী পাড়ি দিয়ে অবশেষে ওয়ালজানের নিকট পৌঁছায়। বন্ধুটি সেরানজিংকে ওয়ালজানের হাতে সপে দিয়ে শুভকামনা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। ওয়ালজান আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে বন্ধুর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিদায় দেয়। চারিদিকে

৫. পুরোহিত

৬. পাহাড়ীদের নিজেদের তৈরি এক প্রকার দেশীয় মদ।

পাহাড়বেষ্টিত ঘন জঙ্গল। এরই ভিতর দিয়ে তারা দুজন অবিরাম চলেছে সামনের দিকে। এভাবে চলতে চলতে এক জনমানবহীন মনোমুগ্ধকর পরিবেশে এসে হাজির হয়। তারা ভাবে এখানে নরেং আর সিমরেং এর কোনো আধিপত্য চলবে না। অথবা তারা কোনোদিন চিন্তাও করতে পারবে না যে সেরানজিং এতদূর এসে বসতি স্থাপন করতে পারে। এভাবে বেশ কিছু দিন তারা গাছের ফলমূল খেয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করে। কিন্তু একসময় ওয়ালজানের মনে কিছু প্রশ্ন জাগে–

: তোমাকে উদ্ধার করেছি বটে, কিন্তু তুমি পরস্ত্রী।

সেরানজিং : খামালের মন্ত্রপাঠ মানি না আমি। বিশ্বাস কর– এ বিয়ে, বিয়ে নয়। ওরা জোর করে বিয়ে দিয়েছে আমাকে।

ওয়ালজান : তুমি যে তার ঘর করেছ!

সেরানজিং : আমাকে জোর করে ওরা থোরার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি– আমি সতী।

ওয়ালজান : প্রমাণ ?

রোনজিং : আমি মরে গেলে তুমি সুখী হবে? (রহমান, ১৯৯৫:৭৮)।

ওয়ালজান এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। নীরবে তাকিয়ে থাকে। সেরানজিং বলে–

: পরীক্ষা করে দেখতে চাও? এই তো আমি প্রস্তুত।

ওয়ালজান তখনো কিছু বুছে উঠতে পারে না। অনেকটা দিশেহারা। কী পরীক্ষার কথা বলছে সেরানজিং। কী করতে চায়? সেরানজিং মনের দুঃখে বলে চলে –

: সালজং দেবতার দোহাই দিয়ে আর লাভ নেই। আমি আসল পরীক্ষায়ই অবতীর্ণ হচ্ছি।

ওয়ালজান : সে কেমন?

সেরানজিং : অগ্নি পরীক্ষা ! আমি আগুনে ঝাপ দেব (রহমান, ১৯৯৫:৭৭-৭৮)।

এবার ওয়ালজানের ঘোর কাটে। কী বলছে সেরানজিং? অগ্নি পরীক্ষার কথা শুনে ওয়ালজানের বুক কেঁপে ওঠে। বনের শুকনো কাঠ, পাতা লতা দিয়ে চিতা তৈরি হল কাঠ ঘষে ঘষে আগুন জ্বালানো হল। তাতে শুকনো কাঠ খড়কুটো পাতা লতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। মুহূর্তে চিতার আগুন আরো দ্বিগুণ আকারে জ্বলতে থাকে। সেরানজিং ওয়ালজান দুজন দুজনকে ধরে কাঁদতে থাকে। এ এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য।

চিতার চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত সেরানজিং কখন যে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই চিন্তায় ওয়ালজান উন্মাতাল হয়ে যায়। একসময় ক্লান্ত সেরানজিং মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ওয়ালজান কি করবে ভেবে পায় না। আত্মবিশ্বাস নিয়ে পরম যত্নে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নেয়। তারপর জামার কোর্তার পকেট থেকে একজোড়া ইয়ারিং এবং একটি আংটি পরম যত্নে বের করে বলে–

: এগুলো আমার মায়ের। এ স্মৃতিটুকু রয়েছে কেবল। এর চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছুই নেই (রহমান, ১৯৯৫:৭৮)।

এভাবেই সেরানজিং পালার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ নাটকের কাহিনির উৎপত্তিস্থল খাসিয়ার দুর্গম পাহাড়ের মিগাম অঞ্চলে (রহমান, ১৯৯৫:৮৪)। মূলত খুবই প্রাচীন একটি কাহিনি। গারো সম্প্রদায়ের যেসব অঞ্চলে তাদের গমণাগমণ বা জীবনাচরণ রয়েছে অর্থাৎ গারো নৃগোষ্ঠীর এদেশে আগমণ ও তৎপরবর্তী জীবনাচরণের ইতিহাস আশ্রয়ী এ কাহিনি। বলা চলে সেরানজিং পালা গারো নৃগোষ্ঠীর জীবন ইতিহাসের স্মারক লিপি (রহমান, ১৯৯৫:৭৮)।

সেরানজিং পালা মূলত বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে খোলা আসরে পরিবেশিত হয়ে থাকে। পরিবেশনা বা রচনার ধরণ বর্ণনাত্মক। খাসিয়া পাহাড়ের এক অজানা অচেনা পিতৃ-মাতৃহীন সুঠাম দেহের অধিকারী সুদর্শন ওয়ালজানের সাথে গারো পাহাড়ের আরেক পিতা-মাতা হারা অনাথ সুন্দরী সেরানজিং এর নিটোল প্রেমের কাহিনি সেরানজিং পালা। নাটকের প্রতিটি চরিত্র খুবই সহজ সরল।

বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় কাহিনির প্রয়োজনে বা নাট্য কাহিনির নাটকীয়তার প্রয়োজনে কিছু চরিত্র সংযোজন করা হয়েছে। মূলত সেরানজিং এবং ওয়ালজানের প্রেমকে কেন্দ্র করে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একপক্ষ সেরানজিং, সেরানী, ওয়ালজান এবং তার বন্ধু। অন্যপক্ষে মাসি, মেসো, মামী এবং মামা। প্রতিটি চরিত্র তাদের গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে নাটকে সরব উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নাটকে যে পারিপার্শ্বিক দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তা যেন একেকটি যাপিত জীবনেব চিত্রকল্প দর্শক-শ্রোতার চোখে দৃশ্যে পরিণত হয়েছে।

নাটকের সংলাপ খুবই সহজ সরল মানুষের মতই সহজ সরল ভাষায় রচিত। তবে প্রতিটি সংলাপে রয়েছে গভীর আবেদনময়ী মর্মস্পর্শী ব্যঞ্জনা। বড় বা দীর্ঘ সংলাপ খুবই কম। নেই বললেই চলে। তবে সংলাপের ভাঁজে ভাঁজে গীত রয়েছে। সাধারণত মনের গভীরতম ভাব প্রকাশ করার জন্য অনেক কথা বলার প্রয়োজন হয়। অনেক ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়। তারপরও কী যেন বলা হল না। যে কথা বর্ণনার মাধ্যমে পুরোটা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না তখনই গীতের প্রয়োজন হয়। এ গীতের মাধ্যমে সাধারণত অনেক অব্যক্ত বা জটিল কথা খুব সহজেই প্রকাশ করা যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের চরণ উল্লেখ করা যায়–'অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি' তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি (ঠাকুরতা, ২০০৭:১৭৯)। কিংবা কাজী নজরুল ইসলামের একটি গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয় সে কি মোর অপরাধ'। এ সকল গানের মধ্যদিয়ে প্রেমিক প্রেমিকার অনেক কথা প্রকাশ করা সহজ হয়ে যায়।

গারো নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সেরানজিং পালা শুরু হয় দল প্রধানের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। তিনি নাট্যদলের পরিচিতি নাটকের কাহিনি সংক্ষেপ এবং উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকদের স্বাগত জানিয়ে পালা শুরু করেন। সেই সাথে দেব-দেবীর বন্দনাও করা হয়। মূল পালা শুরুর পূর্বে সমবেতভাবে বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান বাজানো হয়। এসময় সাধারণ দর্শক এদিক সেদিক যে যেখানেই থাকুক না কেন তারা মঞ্চের দিকে আকৃষ্ট হয়ে মঞ্চের পাশে অবস্থান করে এবং নাটক দেখার জন্য মনোনিবেশ করে। এর মধ্যে সেরানজিং পালার সকল অভিনেতা-অভিনেত্রী সারিবদ্ধভাবে মঞ্চে প্রবেশ করে। মঞ্চে প্রবেশের সময় তারা তাদের নাট্য কাহিনির প্রপ্স বা সাজসরঞ্জাম নিয়ে প্রবেশ করে। অর্থাৎ কাহিনির শুরুতেই দর্শক কিছুটা বুঝতে পারে কার কি ভূমিকা রয়েছে। সেরানজিং পালা অতি প্রাচীনকালের ঘটনার কারণে এ কাহিনি সম্পর্কে আপামর স্থানীয় দর্শক বলতে গেলে পূর্বেই অবগত থাকে। সেজন্যে প্রায় প্রত্যেকেই মঞ্চে প্রবেশের সাথে সাথে বুঝতে পারে অভিনেতারা কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে।

সেরানজিং পালা অভিনয় হয় সাধারণত উন্মুক্ত খোলা মঞ্চে। কখনো গৃহস্থের বাড়ির আঙ্গিনায় কখনো কোনো স্কুলের মাঠে কখনো উঁচু কোনো বারান্দা আবার কখনো কোনো উঁচু ভিটা বা কাঠের পাটাতন তৈরি কোনো অস্থায়ী মঞ্চে। এ পালা সাধারণত রাতের বেলা হ্যাজাকের আলো বা বিদ্যুতের আলোয় মঞ্চস্থ হয়ে থাকে। দর্শক মঞ্চের তিন ঘিরে আবার কখনো চারিদিকে অবস্থান করে। কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বা বসে পালা উপভোগ করে। মহিলা দর্শকদের জন্য আয়োজক কমিটি তাদের সুবিধা অনুযায়ী মঞ্চের একদিকে বসার ব্যবস্থা করে। পালা শুরুর পূর্বে মঞ্চের মাঝখানে একটি বাঁশের তৈরি ঘট বানিয়ে রাখে। পালা শুরুর পূর্বে বাদ্যযন্ত্রী দল মঞ্চের একপাশে অবস্থান করে। পালার শুরুতে একটি গীত পরিবেশন করে। এসময় প্রত্যেকেই মঞ্চে একে একে প্রবেশ করে। তারা মঞ্চের চর্তুদিকে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে গীত পরিবেশন করে। গীত উপস্থাপনার সময় নৃত্যও পরিবেশন করে। নৃগোষ্ঠী নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ননা, নৃত্য ও গীত। এই নৃত্যের মাধ্যমে তারা তাদের গোষ্ঠীগত জীবনভাবনা, ক্রিয়াকর্ম ও বেঁচে থাকার নানা প্রসঙ্গকে মূর্ত করার চেষ্টা করে (আহমদ, ২০০৮:১১)। নাটকে ওয়ালজানের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মে অর্থাৎ পাহাড়ে শিকার করা, জুম চাষ করা, বাঘের সাথে লড়াই করার প্রকাশ ভঙ্গিমায় নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে।

সেরানজিং পালা অতি সহজ সরল ভাষায় বর্ণনাত্মক রীতিতে পরিবেশিত। 'রচয়িতার শৈল্পিক মাত্রা জ্ঞান অনাড়ম্বর ভাষার আশ্রয়ে গল্প কথন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল হয়ে আত্মপ্রকাশ করার ফলে শ্রয়মান কাহিনীর প্রতি সকল শ্রেণীর দর্শকের সহজ অকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত ভাষার বুনন সৌকর্যে চারপাশের জীবন-জনপদ ও প্রকৃতির অপূর্ব চিত্র শ্রোতা-দর্শকের চোখের উপর মূর্ত-মিছিল সৃজন করে' (রহমান, ১৯৯৫:৯১)। নাটকটি উপস্থাপনায় একেকটি পর্ব বিভাজনে একেকটি দৃশ্য মঞ্চস্থ হয়। যেমন সেরানজিং সেরানীর মা-বাবার মৃত্যু, তাদের আশ্রয়লাভ, মাসি নরেং এর বাড়িতে আশ্রয়লাভ, ওয়ালজানের সাথে তাদের পরিচয়, প্রণয়, প্রণয় মুহুর্তে সিমরেং এর আগমন, মেসো-মাসি কর্তৃক সেরানজিং ওয়ালজানের মেলামেশা নিষিদ্ধ করণ, থোরার সাথে সেরানজিং এর বিয়ে, ওয়ালজান সেরানজিং এর সাক্ষাতে বাধা, ওয়ালজান-সেরানজিং এর পলায়ন, সিমরেং-মাংওয়ানের নিকট ধৃত, সেরানী ও ওয়ালজানের রাখাল বন্ধুর সহায়তায় সেরানজিংকে নিয়ে পলায়ন, গভীর জঙ্গলে পলায়ন ও আশ্রয়লাভ এবং সর্বশেষে এক কঠিন সতীত্ত্ব পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া। অনেক সময় নাটকের প্রতিটি দৃশ্য উপস্থাপনার পূর্বে একজন কথক বা বর্ণনাকারী প্রতিটি দৃশ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সাধারণত উপস্থাপন করে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে সেরানজিং পালা বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত। উপস্থাপনায়ও তার প্রভাব লক্ষ করা যায়। বর্ণনাত্মক অভিনয় মানে বর্ণনা, সংলাপ ও সংগীতের মাধ্যমে ঘটনা ও কাহিনির উপস্থাপনা। অভিনয়ের শুরুতেই থাকে আসর বন্দনা। প্রত্যেক দৃশ্যের কি ঘটনা সংগঠিত হবে তা একজন উপস্থাপক দর্শকদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে। মানুষের সহজ সরল ভাষায় রসাত্মক ভঙ্গিতে কাহিনির বর্ণনা উপস্থিত সকল দর্শককে আকর্ষণ করে। নাটকের পাত্রপাত্রী সকলে একদিকে অর্থাৎ একটি রাস্তা প্রবেশ-প্রস্থান হিসেবে ব্যবহার করে। একটি দৃশ্য শেষ হলে এ দৃশ্যের সকল পাত্র-পাত্রী মঞ্চ থেকে প্রস্থান করে। পরের দৃশ্য শুরুর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ দুই দৃশ্যের মাঝে বাদ্যযন্ত্রী দল মিউজিক বাজাতে থাকে। মিউজিক শেষ হলে পরের দৃশ্যে পাত্র-পাত্রী প্রবেশ করে। দুই দৃশ্যের মাঝে প্রায়শ সকলেই বেশ সময় নিয়ে থাকে। তারপরও দর্শক স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করে। কোনো ধরনের উচ্চবাচ্য বা বিরক্ত হয় না। যেন এটাই স্বাভাবিক রীতি।

সাধারণ জীবনে গারো নৃগোষ্ঠী খুবই সহজ সরল জীবন যাপন করে। ফলে এ নাটকের সংলাপ খুবই সহজ সরল। তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ ক্ষোভ, ঝগড়া-বিবাদ, পরচর্চা-পরনিন্দা নেই বললেই চলে। নাটকের কাহিনি বর্ণনা-সংলাপ-নৃত্য-গীতের সম্মিলনে অগ্রসর হয়। নাতিদীর্ঘ বর্ণনার পর সংলাপগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে হয়ে থাকে। নাটকের এই সহজ সরল সংলাপের মধ্যে শৈল্পিক মন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট্ট একটি সংলাপ এর অর্থই অনেক বড়ো হয়ে দর্শকের হৃদয় জয় করে নেয়। যেমন ওয়ালজান যখন সেরানজিং এর চোখ কেন লাল হয়েছে জিজ্ঞেস করে তখন বলে- 'তুমিই তো করেছ! অবাক দৃষ্টিতে ওয়ালজান বলে আমি তোমার চোখে আঘাত করেছি! তখন সে উত্তর দেয়– চোখে করনি– মনে করেছ। সেজন্যে সারারাত আমি ঘুমাতে পারিনি' (শিকদার, ২০১৫:৬৯)। এরকম আবেগঘন সংলাপ নাটকের মধ্যে প্রায়শ শুনতে পাওয়া যায়। গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী হৃদয়স্পর্শী আরো একটি সংলাপ রয়েছে–

: 'উঁচা-নিচা পাইড়্যা পথ কেমুনে দিবাম পাড়ি।
ওয়ালজান বিনে এই গেরামে থাক্‌বাম আমি কেমন করি' (রহমান, ১৯৯৫:৯৩)।

গ্রাম বাংলার কিশোর বয়সের কচি মনের দুই প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ের আবেগঘন সংলাপ এভাবেই কায়মন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমিক প্রেমিকার অবিশ্বাস যেন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে পরিণত হয়। যার পরিণতি মৃত্যু। ওয়ালজানের সুখের জন্য সেরানজিং এর স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ যেন আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ। সেরানজিং এবং ওয়ালজানের হৃদয়-বিদারক প্রেমের কাহিনি গারো সমাজে শত শত বছর ধরে এভাবেই পরিবেশিত হয়ে আসছে।

গারোদের ওয়ানগাল্লা অনুষ্ঠানে সেরানজিং পালার মতো আজিয়া, গ্যালো, রেরে প্রভৃতি নৃত্য পরিবেশনায় চরিত্র, রূপসজ্জা, সংলাপ, সংগীত, পোশাক এবং মঞ্চ ব্যবহারে সহজেই তা নাট্যমূলক আখ্যা দেয়া যায়। এসকল নৃত্যে কাহিনির সংগে তাদের বাস্তব জীবনের সম্পর্ক, সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, রূপসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, মঞ্চসজ্জা এবং পরিবেশনারীতির সাথে সেরানজিং পালার বহুলাংশে মিল লক্ষ্য করা যায়।

সেরানজিং পালা পরিবেশনার সময় খোলা মঞ্চে বর্ণনা নাচ গান এবং অভিনয়ের সময় যে অনিন্দ্য সুন্দর কম্পোজিশন প্রত্যক্ষ করা যায় তা বহুমাত্রিক। এই কম্পোজিশন কখনো অতি সরল, কখনো বৃত্ত, কখনো অর্ধবৃত্ত আবার কখনো হয়ে যায় বক্র রেখা। নাটকের সংলাপ কখনো দীর্ঘ বর্ণনার পর গদ্য সংলাপ এবং তারপর সংগীতের মাধ্যমে গভীরতম মর্মস্পর্শী হৃদয় মাখানো বাণী উচ্চারিত হয়।

সেরানজিং পালা অভিনয়ের সময় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমূহের মধ্যে খক (পিঠে নেয়ার ঝুড়ি), মান্দি রুয়ান (কুলি), জানথি (মদ তৈরির পাত্র), ফং (মদ তুলার পাত্র), মিল্লাম (ধারালো এক ধরনের অস্ত্র), স্ফি (ঢাল), মান্দিআত্মি (দা), গিচ্ছি (কুড়াল), যাত্ম (বল্লম) প্রভৃতি সরঞ্জাম ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া অভিনয়ের প্রয়োজনে তারা বসার টোল, চেয়ার, বাঁশ, লাঠি, মাছ ধরার জন্য গারোরা নিজেদের তৈরি পাত্র ব্যবহার করে থাকে। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ক্যাম, ক্কাল, দামা, আঁদুরু, রাং, বান্‌শি, করতাল, ঢোল, দিমস্রাং প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সেরানজিং পালায় ব্যবহৃত অভিনেতাদের পোশাক পরিকল্পনা তাদের গারো নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির পরিচয় বহণ করে। মেয়েরা দকবান্দা ব্যবহার করে। যা কোমর থেকে পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত মোটা সূতির তৈরি। এর বুনন সাধারণত লম্বালম্বী সারীবদ্ধ বিভিন্ন রং ও রেখার সমন্বয়ে হয়ে থাকে। এর উচ্চতা সাধারণত তিন ফুটের মত হয়। মেয়েরা ব্লাউজের ন্যায় যে জামা পড়ে তাকে দলাজীন বলে। এই দলাজীন এর উপর কাপড় বা সূতার বেশ কারুকার্যময় কাজ করা থাকে। ফলে অভিনয়ের সময় নাটকীয় নাট্যমুহূর্তগুলো দর্শক ভালই উপভোগ করে। গারো নৃগোষ্ঠীর কৃত্যমূলক নাট্যে তাদের যাপিত জীবনের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, নিজস্ব সংস্কৃতি, নৃত্য-গীত বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের হাজার বছরের বাংলার ঐতিহ্যবাহী বর্ণনাত্মক নাট্যাভিনয়রীতির সকল বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে সেরানজিং পালা উপস্থাপন হয়ে আসছে। যা আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যরীতিরই প্রতিচ্ছবি।

তথ্যসূত্র :

আহমদ, আফসার, ২০০৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

চাকমা, মঙ্গল কুমার, সম্পাদিত, ২০১০, বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা (দ্বিতীয় খন্ড), উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

ঠাকুরতা, প্রবীর গুহ, সম্পাদিত, ২০০৭, গীতবিতান (২য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা।

মজিদ, মুস্তাফা, ২০০৬, গারো জাতিসত্তা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

শিকদার, ড. তরুণ কান্তি, সম্পাদক, ২০১৫, জানিরা, সংকলন-২, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি, নেত্রকোনা।

দাংগ, বিধি পিটার, সম্পাদক, ১৯৮১, জানিরা, ৩য় সংখ্যা, উপজাতীয় সাহিত্য সাময়িকী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি, নেত্রকোনা।

রহমান, লুৎফর, ১৯৯৫, নৃ-গোষ্ঠী নাট্য গারো, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

[**Abstract :** A notable ethnic group living in Bangladesh is the Garo community. Each of them has distinct ethnographic, religious, social, political and cultural characteristics. Along with this, there is a treasure trove of various folk songs, fables, fairy tales, folktales, ritual dances, songs and various narrative passages. According to anthropologists, the Garos belong to the Martian people and the Tibetan Burmans belong to the Bodo sub-branch. Their sheranjing pala is served as a traditional pala from generation to generation. Through this turn, the reflection of their past life is found. The main aim of this article is to discuss the themes and artistic ideas of this period of composition and its presentation.]